উৎসব ১৪৩১/১৪৩২

ফরহাদ মজহার

আমাদের সংস্কৃতি সরলরৈখিক কালকেন্দ্রিক না, ঋতুকেন্দ্রিক

সামনে আসছে চৈত্র সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখ। এটি আসলে আলাদা দুইদিনের উৎসব নয়–উৎসব একটাই। সংক্রান্তি যে মুহূর্তে শেষ সেই একই মুহূর্তে বৈশাখেরও আরম্ভ। তাই এবার দুইদিনের উৎসবকে আমরা একই উৎসব হিসেবে গণ্য করে 'উৎসব বাংলাদেশ ১৪৩১/১৪৩২' নামে পালনের জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে আমাদের চেতনার জগতে গুণগত রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেছে, নতুনভাবে নিজেদের নিয়ে ভাবনা এবং নিজেদের নতুনভাবে গঠন করবার প্রণোদনা তৈরি করেছে। নতুন উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের মূর্ত করে তুলতে হবে। তাই এবার আমরা চৈত্রসংক্রান্তি ও বৈশাখের প্রথম দিনকে সকলের কাছে একই মালায় গেঁথে একইসঙ্গে পালন করবার প্রস্তাব দিচ্ছি। কেন? কারণ আমাদের সংস্কৃতি সরলরৈখিক কালকেন্দ্রিক না, ঋতুকেন্দ্রিক। ঋতুর বৃত্তে শেষ বলে কিছু নাই। প্রতিটি বিন্দু একইসঙ্গে বৃত্তের শেষ এবং আবার একই বৃত্তের শুরুও বটে। ঔপনিবেশিক শাসনের আগে উৎসবের ঋতুকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল ও শক্তিশালী। ক্যালেন্ডার ধরে আমরা নববর্ষ পালন করিনি। চিত্রা নক্ষত্রের সৌর যাত্রা অনুসরণ করে চৈত্রসংক্রান্তি পালন করেছি, যা একইসঙ্গে নববর্ষেরও শুরু। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে আমাদের কালচেতনা ও উৎসবের ধারণাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে হবে। তার জন্য আমরা দুই স্তরে উৎসব নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম পর্বে উৎসব নিয়ে রাজনৈতিক-দার্শনিক পর্যালোচনা যেন উৎসবের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব শুধু নয়, ভাবগত ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝি। দ্বিতীয় পর্বে সুনির্দিষ্টভাবে চৈত্রসংক্রান্তি ও নববর্ষ নিয়ে আলোচনা।

আমাদের সংস্কৃতিতে সময়ের ধারণা সরলরৈখিক নয়, বরং বৃত্তাকার। তাই সময়ের ডাকনাম ঋতু। ঋতু আমাদের দেশে বারবারই ফিরে আসে। পুরাতনই নতুন রূপ নিয়ে নতুন সাজপোশাকে আমাদের সামনে হাজির হয়। পুরাতনকে তাই আমরা 'আবর্জনা' বলে উড়িয়ে দেই না, কারণ তাতে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেও উড়িয়ে দেওয়া হয়ে যায়। ইতিহাস ও ঐতিহ্য স্থির কিছু নয়, গতিশীল। তার যেমন পরম্পরা আছে তেমনি তার বয়ানেরও পরম্পরা আছে যা 'বাচনিক পরম্পরা' (Discursive Tradition) নামে আজকাল পরিচিত। আমরা নিজেদের সম্পর্কে নতুন গল্প রচনা করতে চাইলেও ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হয়। তথাকথিত 'পুরাতন'-কে বৈশাখী ঝড়ে 'আবর্জনা' জ্ঞান করে উড়িয়ে ফেলে দেওয়া কাজের কথা নয়। 'আধুনিকতা'-র নামে আমরা পাশ্চাত্যকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে গিয়ে এই কাজ এতকাল করেছি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সবকিছুই আমাদের নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। উৎসব তো অবশ্যই। কিছুদিন আগে ঈদের উৎসব আমরা পালন করলাম, এখন চৈত্রসংক্রান্তি ও নববর্ষ। সামাজিক মিলনমেলা হিসেবে উৎসব আনন্দময়। সন্দেহ নাই। উৎসবের দৃশ্যমান সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে, আমরা তা উপভোগ করি। উৎসবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক বিকাশের সুযোগ থাকে। সেই সুযোগও আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু উৎসবকে রাজনৈতিকভাবে বিচার ও বোঝার বড়োসড়ো ঘাটতি আছে আমাদের। সামাজিক মিলন ও পারস্পরিকতার মধ্য দিয়ে সামাজিক-সামষ্টিক সত্তা আমরা টের পাই। কিন্তু প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষা আমরা এখনও তৈরি করতে পারিনি। সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তার উপলব্ধি ও বিকাশ ছাড়া রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে আমাদের বিকাশও সম্ভব না। এই বিকাশ ছাড়া আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসভায় আমরা শক্তভাবে দাঁড়াতে পারব না। এই দিকটা আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার না। সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে রাজনৈতিকতার সম্বন্ধ গভীর। উৎসবকে আমরা সেভাবে জাতীয়ভাবে চর্চাও করি না। এটা ঠিক যে রাষ্ট্রের তরফে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব আয়োজন করা হয়, কিন্তু জনগণ নিজেদের উদ্যোগে নিজেরা যদি কোনো 'জাতীয় উৎসব' পালনের তাগিদ বোধ না করে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের সামষ্টিক রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটবে না।

জাতিবাদের যুগ আর নাই

এ বিষয়ে কোনো আলোচনা শুরুর আগে আমাদের মনে রাখতে হবে জাতিবাদের যুগ আর নাই, এসেছে পুঁজিতান্ত্রিক গোলকায়নের যুগ। অতএব 'জাতীয় সংস্কৃতি'-র কল্পনাও পুরোনো। পুঁজির আত্মস্ফীতি ও পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়া জাতিসত্তা আর জাতিরাষ্ট্রের ধারণায় অনেক আগে থেকেই ক্ষয় ঘটিয়ে দিয়েছে। পুঁজির লালসার লজিক বা পুঁজির অপ্রতিরোধ্য মুনাফা কামাবার ব্যাকরণ রাষ্ট্রের তথাকথিত সার্বভৌমত্বকে অনেক আগেই দুর্বল ও শিথিল করে দিয়েছে। রাষ্ট্র চাইলেই বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্ত ও নিয়মের বাইরে স্বাধীন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কাছাখোলা অবাধ বাজার ব্যবস্থার নীতি রাষ্ট্রের ক্ষয় ঘটিয়ে চলেছে। রাষ্ট্র কর্পোরেট শক্তির হাতিয়ার হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র অনেক আগেই হারিয়েছে। বাংলাদেশের মতো দুর্বল ও প্রান্তিক রাষ্ট্রে এই সত্য চাইলে সহজেই টের পাওয়া যায়।

শুধু তাই নয়, কর্পোরেট বাজার সংস্কৃতি জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের নিরাকরণ ঘটাতে শুরু করেছে বহু আগে থেকেই। সব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই পুরানা ওয়েস্টফিলিয়ান সার্বভৌমত্বের ক্ষয় প্রকট বাস্তবতা। এই বাস্তবতায় পুরানা জাতিবাদ নিছকই পরিচয়সর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য চিহ্নের অধিক কোনো তাৎপর্য বহন করে না। যদি তাই হয় তাহলে তথাকথিত 'জাতীয়' উৎসবের ধারণা থেকেও আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। ভাবতে হবে গণ-উৎসবের কথা, যে উৎসব জনগণ নিজেরা নিজেদের তাগিদে আয়োজন করে। যে সাংস্কৃতিক উৎসব একইসঙ্গে আমাদের 'গণ'-এর সামষ্টিক রাজনৈতিক সত্তা উপলব্ধির চর্চা হয়ে উঠতে পারে। ব্যক্তি ও সমাজ, খণ্ড ও সমষ্টি বা এক ও অনেকের নিবিড় সম্বন্ধ উপলব্ধির কার্যকর পরিসর উৎসব। রাষ্ট্র সেই ক্ষেত্রে গণের উদ্যোগে সহায়ক হয়। উৎসবের মধ্য দিয়ে জনগণের রাজনৈতিক-সামষ্টিক সত্তার বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও উৎসবে কর্তার ভূমিকায় থাকতে হবে জনগণকেই।

পুঁজিপতি পুঁজির ব্যাকরণ বা লজিক মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু আমরাও চাই বা না চাই নিজের শ্রমশক্তি পুঁজির কাছে বেচে না দিয়ে জীবন রক্ষা করতে পারি না। অন্যদিকে ভোক্তা হিসেবে আমরা পুঁজির তৈরি পণ্যই ভোগ করি। আমাদের ভোগ আমাদের মধ্য দিয়ে পুঁজির মুনাফাই উসুল করে। অর্থাৎ ভোক্তা হিসেবে আমরা পুঁজির মুনাফা আদায়ের ব্যবস্থাই নিশ্চিত করি। পুঁজির বাইরে একালে আমাদের কোনো স্বাধীন কর্তা বা রুহানি সত্তা নাই। পুঁজির আত্মস্ফীতির প্রক্রিয়া ও পুঞ্জীভবন চক্র বাস্তবায়িত করা বা পণ্যের মধ্যে নিহিত মূল্য আদায় বা উসুল করাই আমাদের জীব-জীবনের একমাত্র কাজ ও আরাধ্য হয়ে উঠেছে। এই ক্রূর বাস্তবতা মনে রাখলে আমরা বুঝব পুঁজির বিপরীতে কোনো 'জাতীয়' উৎসব বা 'জাতীয়' সংস্কৃতির ধারণাও অর্থহীন। কারণ যে জাতি-কল্পনার ভিত্তিতে একদা জাতিরাষ্ট্রের ন্যায্যতা তৈরি হয়েছিল সেই বাস্তবতা পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে আর নাই। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে তাই ইতিহাসের কর্তা তাই নয়, 'গণ' বা জনগণ। উৎসবও তাই গণের উৎসব। সেখানে বিভিন্ন ছোটো-বড়ো জাতিগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করে, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন বিশ্বাস, আস্তিক-নাস্তিক, সেকুলার-ধর্মপ্রাণ সকলেই অংশগ্রহণ করে। ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এখানে শক্তি। সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও উৎসব হয়ে দাঁড়ায় ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যসহ 'রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী' হিসেবে জনগণের সামাজিক-রাজনৈতিক সত্তা উপলব্ধি এবং ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের শক্তি অর্জন। জাতিবাদ বা পরিচয়বাদের বিভেদ অতিক্রম করে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে হাজির হবার সাংস্কৃতিক চর্চা তখন মুখ্য হয়ে ওঠে। কারণ লড়াই পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে টিকে থাকার লড়াইটাই একালে মুখ্য।

এই নতুন বাস্তবতা মনে রাখলে আমরা বুঝব উৎসব গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিসর হিসেবে হাজির হয়েছে বটে কিন্তু তাকে জাতিকল্পনার ফ্রেমে আর ধরা যাচ্ছে না। তাকে বুঝতে হবে বিশ্বব্যাপী ক্রমে দৃশ্যমান হয়ে ওঠা গণপরিসর হিসেবে। যে কারণে ফিলিস্তিনের জনগণের লড়াইয়ের প্রতি সংহতি জানানোও উৎসবের অন্তরঙ্গ দিক হয়ে উঠেছে–যাকে আর পুরানা জাতিবাদের ফ্রেমে ধরা যায় না। এখানে আমরা বিশ্ব নাগরিক হয়ে উঠি। আমাদের সাংস্কৃতিক লড়াই একইসঙ্গে সেকুলার জায়নবাদসহ সকল প্রকার পরিচয়সর্বস্ব জাতিবাদের বিরুদ্ধে, যেন আমরা বিশ্ব-নাগরিক হয়ে উঠতে পারি।

সকল প্রকার উৎসবের রূপের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির ছাপ থাকবে অবশ্যই, কিন্তু তার মর্ম হবে আরও বৈশ্বিক ও সর্বজনীন। বাংলাদেশের বাস্তবতায় সেটা শুধু বাঙালির উৎসব হবে না, সেটা হবে ছোটো-বড়ো সকল জাতির পারস্পরিক আদানপ্রদানেরও পরিসর। উৎসব হবে জনগণের। 'গণ' পরিবর্তিত বিশ্বে সংকীর্ণ অর্থে সেকুলার কিংবা ধর্মীয় 'জাতি' বা 'সম্প্রদায়' হিসেবে নয়, বরং হয়ে উঠবে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় ছোটো-বড়ো সকল জাতিসত্তার বিকাশের অঙ্গীকার নিয়ে গঠিত রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী। বিশ্বে আমাদের ন্যায্য স্থান ও হিস্যা আদায় করে নিতে হলে এই বোঝাপড়া ও ঐক্যের ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নাই। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের গঠন করতে চাইলে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। দরকার নতুন নীতি, আদর্শ ও কৌশল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবার। এই দিক থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও উৎসবের তাৎপর্য গভীর। এই নিবন্ধে আমরা উৎসবের রাজনৈতিক-গাঠনিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে উৎসবের দর্শন ও রাজনীতি। আর দ্বিতীয় ভাগে চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখের প্রথম দিন বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা। দুইদিন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পালন না করে একইসঙ্গে পালন করবার পক্ষে যুক্তি দেব। আমরা এর নাম দিতে পারি 'উৎসব বাংলাদেশ ১৪৩১/১৪৩২'।

উৎসবের দর্শন ও রাজনীতি

হেগেল ও উৎসব

'Festivals are moments of reconciliation, when individuals feel themselves one with their people and its customs.'

— Lectures on the Philosophy of Religion, Vol. 1

সমাজে আমরা নিজ নিজ চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান এবং পারস্পরিক লেনদেনের মধ্য দিয়ে জীবনধারণ করি। আধুনিক সমাজে ব্যক্তি স্বাধীন কিন্তু স্বার্থান্বেষী; ব্যক্তির লক্ষ্য নিজের প্রয়োজন মেটানো। এই সমাজ বাজার, পেশাজীবী গোষ্ঠী এবং নানান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। যার শীর্ষে রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতার দাবি নিয়ে রাষ্ট্র।

জর্মন দার্শনিক হেগেল আধুনিক রাষ্ট্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজকে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। এক ভাগে আছে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের পরিসর। হেগেল এর নাম দিয়েছেন 'সিভিল সোসাইটি' (Civil Society) যার আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ 'নাগরিক সমাজ'। তবে আক্ষরিক অনুবাদে হেগেলকে বোঝা কঠিন হয়। হেগেল 'নাগরিক সমাজ' বলতে আসলে বুঝিয়েছেন আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থার অন্তর্গত সমাজ। বাজার ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র। বাজারি প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সমাজের সামষ্টিকতা কিংবাা রাজনৈতিক সত্তার উপলব্ধি কঠিন করে তোলে। ব্যক্তির বিপরীতে সমাজ হাজির থাকে ব্যক্তির কামনা বাসনা চরিতার্থ করবার উপায় হিসেবে। বাজার বা হেগেলের 'নাগরিক সমাজ' অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্র। এখানে রীতিমতো 'যুদ্ধাবস্থা' বিরাজ করে। প্রত্যেকে নিজের স্বার্থে সতত অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। হেগেলের দাবি, 'In civil society each individual is his own end; everything else is nothing to him.' – Philosophy of Right, p. 182।

তারপরও 'নাগরিক সমাজ' হেগেলের কাছে পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্তরে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শিক বিকাশের একটি ধাপ। যদিও স্বার্থান্বেষণই নাগরিক সমাজের ধর্ম তবুও আইন, নৈতিকতা ও প্রতিষ্ঠান নাগরিক সমাজকে একটি ন্যায়সঙ্গত সামাজিক বন্ধনের মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করে। এখানে ব্যক্তি সমাজকে তার বিপরীতে তার বিকাশের বাধা হিসেবে হাজির দেখতে পায়।

এর বিপরীতে রয়েছে রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র (Political Society/State)। প্রাচীন বামপন্থিরা রাষ্ট্রকে শুধু বল প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করতেন। কিন্তু হেগেল কিংবা মার্কস কেউই সেভাবে রাষ্ট্রকে ক্ষমতা প্রয়োগের হাতুড়ি বা হাতিয়ারে পর্যবসিত করেননি। একালে মিশেল ফুকো আমাদের বুঝিয়েছেন ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত একচেটিয়া বল প্রয়োগের শক্তি হিসেবে ভাবা ভুল। ক্ষমতা উৎপাদকও বটে কারণ ক্ষমতার সঙ্গে জ্ঞানচর্চা বা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গী জড়িত। একইভাবে সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক চর্চাও যুক্ত। ক্ষমতাকে আমরা যেভাবে নেতিবাচকভাবে হাজির করি মিশেল ফুকো তাকে ঠিক মনে করেন না। কারণ ক্ষমতা গঠনমূলক বা উৎপাদনমূলকও (Productive) হতে পারে। অন্যদিকে সহিংসতা বা সশস্ত্রতার যে একচেটিয়া ক্ষমতা রাষ্ট্র ভোগ করে সেটা স্রেফ ক্ষমতা (Power) থেকে জাত নয়, বরং সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) ধারণা থেকে জাত। তাই ক্ষমতা মানেই সার্বভৌম নয়, সার্বভৌম ক্ষমতা হয় একান্তই রাষ্ট্রের, অথবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের। তাই বলা হয় গণসার্বভৌমত্বই গণতন্ত্র। ইংলণ্ডের ওয়েস্টমিনিস্থার পার্লেমেন্টারি ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদের ইত্যাদি।

জুলাই গণভ্যুত্থানে আমরা গণসার্বভৌমত্ব (People's Sovereignty) কায়েমের জন্য লড়েছি। কেন? কারণ ক্ষমতা যেন তথাকথিত সংবিধান বা রাষ্ট্র নামক বিমূর্ত প্রতিষ্ঠানের আড়ালে আমলা, সশস্ত্র বাহিনী এবং লুটেরা ও মাফিয়া শ্রেণির ক্ষমতা হয়ে আবার আমাদের টুঁটি টিপে ধরতে না পারে। তাই গণসার্বভৌমত্বই গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে ক্ষমতা একান্তই জনগণের; জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের 'পরম অভিব্যক্তি'। অর্থাৎ জনগণ তাদের সামষ্টিক মঙ্গলের জন্য যা চায় তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা নিজের হাতে রাখা এবং নিজেরা চর্চা করাই গণসার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্রের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, সার্বভৌমত্বের নয়।

হেগেল, মার্কস বা ফুকো না পড়লেও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা থেকে গণসার্বভৌমত্ব কী জিনিস সেটা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা উচিত। ফ্যাসিস্ট শাসককে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের মধ্য দিয়ে যে নতুন রাষ্ট্র গঠনের গাঠনিক শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল সেটাই ছিল গণসার্বভৌমত্ব। কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার এই রূপের গাঠনিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য আমরা বুঝিনি বলে ক্ষমতা হাতে পেয়েও জনগণের ক্ষমতাকে আমরা গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রূপ দিতে পারিনি। পুরানা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই আমরা আবার রাষ্ট্রকে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

এই পরিস্থিতিতে সামনের দিনগুলোতে আমাদের লড়াইয়ের নীতি ও কৌশল কী হবে তা নিয়ে গভীর ভাবে ভাবতে হবে। নতুন বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হলে আমাদের বুঝতে হবে কেন হেগেল রাষ্ট্রকে জনগণের নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের পরিপূর্ণ প্রকাশ (the actuality of the ethical idea) দাবি করেন। রাষ্ট্রে নিছকই প্রশাসনিক হাতিয়ার বা যন্ত্র নয়, রাষ্ট্রের অবশ্যই নৈতিক-আদর্শিক সত্তা (ethical totality) রয়েছে যা সরাসরি জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত। বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজ বা সামাজিকতার মধ্যে ব্যক্তি যেমন নিজের পরমার্থ আবিষ্কার ও উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি রাষ্ট্রও ব্যক্তির মধ্য দিয়ে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শকে 'বর্তমান' বা বাস্তব করে তোলে। ব্যক্তি ও নাগরিক সমাজ বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধের মধ্য দিয়ে সামষ্টিক রাজনৈতিক সত্তা উপলব্ধি করে এবং সেই সত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে কর্তার ভূমিকা পালন করতে অনুপ্রাণিত ও আগ্রহী হয়। এই রাজনৈতিক সত্তা সর্বজনীন অভিপ্রায় বা ইচ্ছার (universal will) রূপ নিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঊর্ধ্বে হাজির থাকে এবং বৃহত্তর সামাজিক মঙ্গলে রূপ নেয়।

হেগেলের কাছে নাগরিক সমাজ হচ্ছে আধুনিকতা ও পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ–যেখানে গঠনতন্ত্র (Constitution) ও আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি 'স্বাধীন'। কিন্তু ব্যক্তি পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে একাকী, নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন সত্তা। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বিচ্ছিন্নতা ভোগই ব্যক্তির নিয়তি। আধুনিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই বিচ্ছিন্নতার নৈতিক ও রাজনৈতিক মীমাংসা চেষ্টা করে। সমাজে ব্যক্তি একাকী ও নিঃসঙ্গ হলেও রাষ্ট্রের পরিসরে ব্যক্তি সমষ্টির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত দেখতে পায়। রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির সামষ্টিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। ব্যক্তি স্বাধীন হয়েও সামষ্টিক-রাজনৈতিক সত্তার অন্তর্ভুক্ত থাকতে আগ্রহী হয়। তাই, রাষ্ট্রকে হেগেল ব্যক্তি স্বাধীনতার চূড়ান্ত রূপ গণ্য করেছেন।

হেগেল সরাসরি 'জাতীয় উৎসব' বা 'সাংস্কৃতিক তৎপরতা' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেননি। না করলেও, তার চিন্তায় সাংস্কৃতিক উৎসব আত্ম-উপলব্ধি ও জনগণের সামষ্টিক চেতনা বিকাশের সহায়ক এবং সমষ্টিগত পরিচয় এবং রাজনৈতিক ঐক্যবোধ স্ফুরণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক-গাঠনিক প্রক্রিয়াকে জোরদার করে। হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তায় গণ-সামাজিক উৎসবের পক্ষে শক্ত যুক্তি রয়েছে। ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয় বরং সমাজের অন্তর্গত উৎসব–সেই উপলব্ধিকে দর্শনীয়, বোধগম্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন করার মাধ্যম। উৎসব বা সকলে মিলে সংস্কৃতিচর্চা রাষ্ট্রের নৈতিক-আদর্শিক ভিত্তিকে দৃশ্যমান করে তোলে। ব্যক্তি শুধু ভোট দেবার অধিকারী বা স্রেফ আইন মানা নাগরিক নয়, বরং সমাজ ও রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাংস্কৃতিক উৎসব আমাদের এই সত্য গভীরভাবে 'অনুভব' করার সুযোগ তৈরি করে।

মার্কস হেগেলের বাজারভিত্তিক আর্থসামাজিক পরিসর (Civil Society) ও রাজনৈতিক পরিসর (Political Society)-এর পার্থক্য মানেন, কিন্তু আধুনিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব শুধু রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের দ্বারা নিরসন করা যাবে সেটা মানেন না। হেগেলের দার্শনিক চিন্তায় ব্যক্তি (Individual) ও সমষ্টি (Collective Whole বা Totality)-র সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। একদিকে ব্যক্তির স্বাধীনতা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ব্যক্তির নৈতিক-আদর্শিক পরিপূর্ণতা কেবল সমষ্টির রাজনৈতিক সত্তায়–বিশেষত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশের মধ্যেই নিহিত। হেগেল এই কথাটাই জোর দিয়ে দাবি করেন। মার্কস অবশ্য হেগেলের ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের ওপর গঠিত আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা সম্ভব বলে মার্কস মনে করেন না। হেগেল যে নৈতিক-আদর্শিক পূর্ণতার কথা ভেবেছেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন একটি সমাজ অবশ্যই কল্পনা করা যায় যেখানে সমাজ বা সমষ্টির মধ্যেই ব্যক্তি যেমন নিজের পরমার্থ আবিষ্কার, উপলব্ধি ও উদ্‌যাপন করে, তেমনি সমাজ বা সামষ্টিক সত্তা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের মধ্য দিয়েই বিকশিত ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। মার্কসের হেগেল পর্যালোচনা থেকে বলা যায় ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব নিরসনই 'কমিউনিজম' যেখানে ব্যক্তি আর সমাজের মধ্যে সকল বিরোধের ঐতিহাসিক অবসান ঘটেছে। তার জন্য অবশ্যই অর্থনৈতিক সম্পর্কের রূপান্তর দরকার এই ক্ষেত্রে মার্কসের সমালোচনা যথার্থ। পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক বহাল রেখে ব্যক্তি ও সমাজের, কিংবা নাগরিক ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা আমরা কখনই করতে পারব না। এই সমালোচনা সত্ত্বেও মার্কস রাজনৈতিক পরিসর নির্মাণের কাজকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করেছেন। এবং অর্থনৈতিক মুক্তির আগে রাজনৈতিক মুক্তির লড়াইকে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করেছেন। পুঁজির বিপরীতে 'গণ' বা জনগণের সামষ্টিক সত্তাকে উপলব্ধির বিষয়ে পরিণত করা এবং জনগণের সামষ্টিক গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ তাই গুরুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও উৎসব তাই রাজনৈতিক অর্থাৎ সামষ্টিকতার উদ্‌যাপন ও উপলব্ধির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিসর। রাজনৈতিক পরিসর থেকে সাংস্কৃতিক পরিসরকে তাই আলাদা করা যায় না।

আমরা এই দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রশ্নকে সাংস্কৃতিক তৎপরতার দিকে থেকে বিবেচনা করে দেখতে পারি। সাংস্কৃতিক পরিসরকে যখন আমরা মিলনমেলা বলি তখন তার চরিত্রকে নিছকই সামাজিক ভাবলে চলবে না। সংস্কৃতি আমাদের রাজনৈতিক-সামষ্টিক সত্তা উপলব্ধির গুরুত্বপূর্ণ পরিসর। সংস্কৃতি স্রেফ বিনোদনের ক্ষেত্র নয়, সামষ্টিক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের ক্ষেত্র। এমনই একটি ক্ষেত্র যখন প্রণোদনায় ব্যক্তি স্বার্থের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে সামষ্টিক রাজনৈতিক সত্তায় স্বেচ্ছায় নিজেকে মিলিয়ে বা মিশিয়ে দেবার তাগিদ বোধ করে। যদি এতটুকু আমরা বুঝি তাহলে বুঝব সাংস্কৃতিক পরিসর এবং বিশেষভাবে সামাজিক উৎসব বাংলাদেশকে নতুনভাবে গঠন করবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। উৎস ও সাংস্কৃতিক পরিসর নিজেদের নতুনভাবে গঠন করবার স্বপ্ন, কল্পনা, আশা, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের কৌশল আবিষ্কারের ক্ষেত্র।

লক্ষ্যের দিক থেকে একই হলেও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড থেকে সাংস্কৃতিক তৎপরতার চরিত্র আলাদা। সাংস্কৃতিক পরিসর সকলে মিলে সমষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ চর্চার ক্ষেত্র। সমাজ বা সমষ্টির বাইরে ব্যক্তির কোনো পরমার্থিক তাৎপর্য নাই এই উপলব্ধি বা চেতনা আমরা সাংস্কৃতিক পরিসরের তৎপরতা থেকে লাভ করি। সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই আমারা সমষ্টিগতভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য টের পাই এবং সকলের মধ্যে নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করি। বিশ্বসভায় আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির থাকা একইসঙ্গে বৈশ্বিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমাদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করে নেবার কাজও বটে।

রুশো ও উৎসব

'Festivals... remind people that they are not isolated individuals but citizens of a shared community.'

— রুশোর 'Letter to d'Alembert on the Theatre' (1758)

যদিও 'সামাজিক চুক্তি'-তে সরাসরি উৎসবের আলোচনা কম, রুশো তাঁর অন্যান্য রচনায় (যেমন 'Letter to d'Alembert on the Theatre') সহ উৎসবের ভূমিকাকে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে উঠবার অপরিহার্য তৎপরতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। রুশোর দর্শনে 'উৎসব' (festival) কেবল একটি সাংস্কৃতিক বা বিনোদনমূলক আয়োজন নয়, বরং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও নৈতিক অভিজ্ঞতা, যা স্বাধীন ব্যক্তিদের সমাজে 'সামষ্টিক ইচ্ছা' (volonté générale বা general will) গঠনের জন্য অপরিহার্য। উৎসব রুশোর কাছে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করবার গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চর্চা। স্বাধীন কিন্তু সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে সমবায়ী সত্তায় রূপান্তরিত করবার প্রক্রিয়া।

রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ The Social Contract (১৭৬২)-এ তিনি বলেন, প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো 'সাধারণ ইচ্ছা'। অর্থাৎ সকল নাগরিকের মিলিত স্বার্থ। অর্থাৎ সামষ্টিক ইচ্ছা। এটা ব্যক্তিগত ইচ্ছার যোগফল নয়, বরং এমনভাবে সকলের ইচ্ছা ধারণ করা যার ফলে তা আর শুধু বিভিন্ন ব্যক্তির ইচ্ছার সমষ্টি না হয়ে গুণগতভাবে একক রাজনৈতিক কর্তাসত্তার অধিকারী হয়।

'Each of us puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general will.'

— The Social Contract, Book I, Ch. 6

প্রশ্ন হচ্ছে উৎসব কীভাবে এই 'সামষ্টিক ইচ্ছা' গঠনে সহায়ক হয়? আধুনিক সমাজে মানুষ বিচ্ছিন্ন ও আত্মকেন্দ্রিক। এই বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে সামষ্টিক চেতনা উন্মেষের জন্য উৎসবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি পরিচয়ের ঊর্ধ্বে সামষ্টিকতার বোধ জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে উৎসবে সমাজের সামষ্টিক কর্তাসত্তারই উদ্বোধন দেখি আমরা। সমাজের বিভিন্ন ও বিচিত্র সব মানুষ তাদের জাতিগত, সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য সত্ত্বেও যদি উপলব্ধি করতে পারে যে তারা আরও বৃহত্তর পরসরের অন্তর্গত তখন তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

জঁ-জাক রুশো তাঁর 'সামাজিক চুক্তি' (The Social Contract, 1762) গ্রন্থে উৎসব ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে রাষ্ট্রের ঐক্য, নৈতিক-আদর্শিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এবং সাধারণ ইচ্ছা (General Will) গঠনের প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। রুশো মনে করেন, উৎসব বা গণ-অনুষ্ঠানগুলি সামষ্টিক ইচ্ছা (General Will) গঠনে সাহায্য করে। যখন নাগরিকরা একত্র হয়ে উৎসব পালন করে, তখন তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে গিয়ে সমষ্টির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। রুশোর সামাজিক চুক্তির মূল উদ্দেশ্য–একটি নৈতিক ও সমষ্টিগত সত্তা গঠন। উৎসব সেই গঠন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে।

'সিভিল রিলিজিয়ন' (Civil Religion)-এর ধারণা আমরা রুশোর কাছ থেকে পাই। এই ধারণার দ্বারা উৎসবকে রুশো ধর্মীয় ও নাগরিক কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। উৎসবকে তিনি দেখেন নাগরিকদের রাষ্ট্রের মূল্যবোধ ও নৈতি-নৈতিকতার আদর্শ উদ্‌যাপন হিসেবে। এর মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে জনগণ তাদের ঐক্যের ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করে ও উদ্‌যাপন করে। উৎসব ব্যক্তির ঊর্ধ্বে সামষ্টিক রাজনৈতিক সত্তা উপলব্ধি এবং সমষ্টির প্রতি আনুগত্য জাগ্রত করে।

তবে রুশোর সাবি হচ্ছে উৎসবগুলি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, যেন উৎসব সামাজিক শ্রেণিভেদ বা বৈষম্যমুক্ত থাকে। যে কারণে তিনি প্রাকৃতিক ও সরল গ্রামীণ উৎসবকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করেছেন। অভিজাত বা কৃত্রিম সংস্কৃতি (থিয়েটার ইত্যাদি) নিরুৎসাহিত করেছেন। উৎসবের উদ্দেশ্য তখনি পূর্ণ হয় যদি নাগরিকদের মধ্যে স্বাধীনতা ও সমতার বোধ জাগ্রত করা সম্ভব হয়। উৎসব রুশোর দর্শনে নাগরিক শিক্ষা-এর গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। উৎসব ব্যক্তিকে সমাজের সাথে যুক্ত করে নৈতিক দায়িত্ববোধ শেখায়। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে উৎসবগুলিতে নাগরিকদের রাষ্ট্রের ইতিহাস ও নায়কদের স্মরণ করা উচিত, যেন দেশের জন্য ভালোবাসা এবং যাঁরা সমাজের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন তারা জনগণের সামষ্টিক চেতনার অংশ হতে পারে।

উৎসবের সমষ্টিগত কার্যকলাপ চর্চার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ অতিক্রম করে যাবার শর্ত তৈরি করে। উৎসব তাই সকলের অবদান রাখে। রুশোর 'সামষ্টিক ইচ্ছা' তত্ত্বের সাথে উৎসব সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ সমাজের সম্মিলিত সদিচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি। রুশো উৎসবকে সরাসরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসেবে দেখলেও সতর্ক করেছিলেন যে উৎসব যেন কোনোভাবেই বাধ্যতামূলক বা কৃত্রিম না হয়। যেমন, অভিজাত শ্রেণির বিলাসী উদ্‌যাপন। উৎসবকে ব্যাপক গণ-অংশগ্রহণমূলক, স্বতঃস্ফূর্ত ও নৈতিক-আদর্শিক মূল্যবোধসম্পন্ন হতে হবে।

এটা পরিষ্কার রুশোর দৃষ্টিতে উৎসব নিছকই বিনোদন নয়, বরং গণতান্ত্রিক ও নৈতিক রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি। এটি নাগরিকদের মধ্যে

সংহতি, স্বাধীনতার চেতনা ও সাধারণ ইচ্ছার বিকাশে উৎসব সহায়ক, যা সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। রুশো এবং হেগেল উভয়েই উৎসব বা সমষ্টিগত অনুষ্ঠানকে রাষ্ট্র ও সমাজের সংহতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করলেও তাদের দার্শনিক প্রেক্ষাপট, রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং উৎসবের ভূমিকা সম্পর্কে চিন্তায় মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

উৎসব বাংলাদেশ ১৪৩২

আমাদের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা সবই নতুন বাস্তবতায় নতুন করে বেছে নেবার জন্য আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের অতীত ও ইতিহাসকে নিয়ে নতুন সময়ে আমরা নতুন করে ভাবতে ও পর্যালোচনা করতে শিখব। সজীব চিন্তার চর্চা গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই জনগণ নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়, আমাদের ঐক্যের ক্ষেত্রগুলো আমরা শনাক্ত করতে পারি। নতুন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে আমরা বিশ্বসভায় শিরদাঁড়া খাড়া করে হাজির হতে পারি।

এবার চৈত্রের শেষ ও বৈশাখের আগমনকে আমরা একইসঙ্গে আমরা পালন করতে চাই। জনগণের উৎসব বা লোকায়ত সংস্কৃতিকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সর্বজনীন উৎসবে রূপ দেওয়া বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে।

চৈত্র সংক্রান্তি পালনের বিষয়টি বছর শেষ ঘোষণার জন্য নয়, কিংবা পরদিন নতুন বছর শুরু হচ্ছে বলে 'নববর্ষের' প্রস্তুতিও নয়। দিনটি পালন হয় গ্রামের কৃষক পরিবারগুলোতে। মানুষের শরীর ও প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ রচনার চর্চা হিসেবে। আমরা তো একালে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা ভুলে গিয়েছি। সংক্রান্তি মানে কোনো গ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত থেকে প্রতিমাসে ঋতুর ক্ষণ উদ্‌যাপন। তার মানে অন্যান্য মাসেও সংক্রান্তি আছে, এবং আমরা তা উদ্‌যাপন করতাম। এই চর্চা নদীমাতৃক সবুজ বদ্বীপে বহু দীর্ঘকালব্যাপী জারি আছে, শহরের মানুষ সেটা জানেন না। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্বন্ধ রচনার চর্চা বাংলার কৃষক সমাজ হাজার বছর ধরে করে আসছেন। আমাদের দেহ বা জীবাবস্থার সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্র, গাছপালা, জীব-অণুজীবসহ সকল প্রাণ এবং অপ্রাণের সম্বন্ধ রয়েছে। চৈত্রের মহাবিষুব সংক্রান্তি পালনের পেছনে সেই সম্বন্ধেরই উদ্‌যাপন করা হয়। যে জ্ঞানকলা, বিজ্ঞানবুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি বিশেষত কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে প্রাণ ও প্রকৃতির পুনরুৎপাদন ও বিকাশের অতি আবশ্যিক কর্তব্য পালনের রীতি, কোনো অবস্থাতেই আমরা যেন তা ভুলে না যাই।

ঋতুর যে ভাব বা ধারণা কৃষি-সংস্কৃতিতে প্রবল সেখানে সময় কখনো শেষ হয়ে যায় না, কিংবা আবার নতুন শুরুও হয় না, একই ঋতু বারবার ফিরে আসে। চিত্রা নক্ষত্রের রাশিচক্র অতিক্রম করে যাবার সময়টা চৈত্রের সংক্রান্তি, কিন্তু নভোমণ্ডলে নিজের কক্ষ পরিভ্রমণ শেষে সেই একই চিত্রা ফিরে আসবে আবার আগামী চৈত্রে। নতুন নক্ষত্র নয়, পুরানা নক্ষত্রই ফিরবে। চক্রাবর্তে প্রত্যাবর্তনের এই ধারণা সংক্রান্তিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এর সম্পর্ক গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে, মূলত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গেই। বিপরীতে নতুন বছরের ধারণা ঘড়ি ও ক্যালেন্ডার থেকে উৎপন্ন। আমরা ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা ভুলে গিয়েছি। চাঁদ-সূর্য দেখে দিন-রাত বোঝার চর্চাও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সময় বলতে আমরা সরলরেখা বুঝি, বৃত্ত কিংবা প্রত্যাবর্তনের ধারণা আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

তাহলে চৈত্র সংক্রান্তি হচ্ছে প্রকৃতি ও গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঝালিয়ে নেবার দিন। আমরা জীব হিসেবে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নই এটা উপলব্ধি করা, জানা এবং সেই উপলব্ধিকে চরিতার্থ করবার জন্যই নানান আচার, উৎসব ও উদ্‌যাপন। খাদ্য-ব্যবস্থা তার অন্যতম দিক। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বিশেষ বিশেষ খাবার পরিকল্পিতভাবে খাওয়া নিয়ম। এই দিন প্রাণিজ আমিষ নিষিদ্ধ। তাছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চর্চা রয়েছে; আবাদি ফসল আমরা তো সারা বছরই খাই, চৈত্র সংক্রান্তিতে তাই অনাবাদি শাকসবজি খাওয়াই রীতি; অর্থাৎ চাষের শাকসবজি না, বরং কুড়িয়ে এনে চৌদ্দ রকমের শাক এবং চৈতালি মৌসুমের সবজি, পাতা, মুড়া ইত্যাদি খেয়ে চৈত্র সংক্রান্তি পালন করতে হবে।

গ্রামের কৃষকের স্মৃতি ও জ্ঞানচর্চার দিবস হিসেবে সবারই প্রায় অলক্ষ্যে দিনটি পালিত হয়ে যায়। চৈত্র সংক্রান্তির মহিমা এখানেই। এখনো গ্রামের মানুষ তার জ্ঞান অনুযায়ী যেসকল অনাবাদি লতাপাতা শাকসবজি পাবার কথা ছিল তা খুঁজে না পেলে আফসোস করেন। আমাদের বাপ-দাদার সময়ে যা দেখেছি, কিংবা মায়েরা যেসব শাকসবজি দিয়ে চৈত্র সংক্রান্তি করতেন, তা এখন নাই। রাস্তাঘাট হয়েছে, বড়ো বড়ো দালানকোঠা হয়েছে, তাই অনাবাদি শাকসবজি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব আছে কি নাই সেটা জেনে আমাদের কেমন সতর্ক হতে হবে সেটা নির্ধারণের জন্য হলেও চৈত্র সংক্রান্তি পালন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলার কৃষক নারী চৈত্র সংক্রান্তিতে ঘরের পাশে মাঠের আনাচকানাচে শাক কুড়াতে বেরোয়। নিয়ম আছে তাকে চৌদ্দ রকম শাক কুড়াতে হবে। আবাদি নয় কিন্তু অনাবাদি; অর্থাৎ রাস্তার ধারে, খেতের আইলে, চকে আপনজালা শাক তুলতে হবে। অর্থাৎ যে শাক লতাপাতা কেউ আবাদ করেনি, আপনা থেকেই গজিয়েছে–নিজে থেকে হয়ে ওঠা শাক। এই মৌসুমে যা টিকে থাকে। এই শাক তোলার অধিকার কৃষক নারীর থাকে। তার দেখার বিষয় হচ্ছে যে শাক তাঁরা খুঁজছেন সেই শাক গ্রামে আছে কি না। ধনী পরিবারের নারীরা নিজে শাক তুলতে বের না হলেও তার আশপাশে যারা গরিব নারী আছেন তাঁদের মাধ্যমে শাক তুলিয়ে আনেন। মনে রাখতে হবে, বলা হয় 'শাক তোলা', 'শাক কাটা' নয়। কখনোই তারা পুরো গাছটি উপড়ে ফেলে শাক আনবেন না। অতি যত্ন করে পাতাটি তুলে আনবেন। গাছ যেমন আছে তেমনই থাকবে।

কৃষক নারী খবর নিতে চায় প্রকৃতির যে অংশ অনাবাদি–যে অংশ কৃষি সংস্কৃতির সংরক্ষণ করে রাখার কথা, নইলে প্রাণের সংরক্ষণ ও বিকাশ অসম্ভব–সেই অনাবাদি প্রকৃতি ঠিক আছে কি না। যেসব গাছপালা, প্রাণ ও প্রাণী আবাদ করতে গিয়ে আবাদি জায়গায় কৃষক তাদের দমন করেছে, উঠতে দেয়নি, থাকতে দেয়নি, কিষানি মেয়ে এই দিনে খবর নেয় তারা সব ঠিকঠাক আছে তো? চৈত্র সংক্রান্তিতে চৌদ্দ রকম শাক খাওয়া তো আসলে সব রকম গাছপালা প্রাণ ও প্রাণীর হালহকিকতের খোঁজ নেওয়া। এটা নারীর সূক্ষ্ম জ্ঞানচর্চা। এই জ্ঞান নারীদের মধ্যে মা থেকে মেয়ে, পাড়া-প্রতিবেশীরা ভাগাভাগি করে শেখে। 'চৌদ্দ' সংখ্যাটা প্রতীকী। আসলে বেশি পাওয়া গেলে আরও ভালো। তবে চৌদ্দ রকম শাক পাওয়াই এখন কঠিন হয়ে গেছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে কৃষক মেয়েকে খবর নিতে হবে 'পুরুষ' সারাবছর যে 'চাষ' করল তাতে অনাবাদি জাতি বা প্রজাতির হালহকিকতের কী দাঁড়াল? 'চাষ' করার অর্থ আবাদি ফসলের দিকে মনোযোগ দেওয়া কিন্তু অনাবাদি ফসলের বিশাল ক্ষেত্র যেন তাতে নষ্ট বা কৃষি ব্যবস্থায় গৌণ না হয়ে পড়ে তার জন্যই চৌদ্দ রকম শাক তোলা ও খাওয়ার রীতি চালু হয়েছে।

এটা তাহলে পরিষ্কার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে চৈত্র সংক্রান্তি সাংস্কৃতিক ও ভাবগত তাৎপর্য ছাড়াও বৈষয়িক জীবনযাপনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। দেহ ও মনের বিচ্ছেদ নয়, ঐক্য উদ্‌যাপনই চৈত্রের শেষ দিনের উৎসব। সংস্কৃতি এখানে সরাসরি প্রাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

একটি বছর যখন পার হয়ে যায়, আবার বছর ঘুরে আরেকটি বছর ফিরে আসে, তখন সবকিছুই একই রকম থেকে যাবার কথা না। হবার কথাও নয়। যেহেতু আমাদের গ্রামীণ পরিবেশ ও জীবের জীবন মূলত কৃষির সাথে যুক্ত, তাহলে কৃষির পরিবর্তনের সাথে আমাদের চাষাবাদ ও খাদ্যব্যবস্থায় কিছু না কিছু পরিবর্তন হবার কথা। তাই প্রকৃতির সঙ্গে সারাবছর কী আচরণ করলাম তার বিচারের দিন চৈত্র সংক্রান্তি। প্রতিবছর কৃষির অবস্থা একরকম থাকছে না। আবাদ করার অর্থ আমাদের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানো। চাহিদা মেটাবার জন্য প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা থাকবার কথা তার বদলে নিজেদের চাহিদা মেটাবার জন্য আমরা খাদ্য উৎপাদন করি। প্রকৃতির ভারসাম্যে হস্তক্ষেপ করি। চৈত্র সংক্রান্তিকে তাই বলা যায় বছরব্যাপী আবাদি ফসলের কারণে অনাবাদি প্রকৃতির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের দিন। সেই জন্যই চৈত্র সংক্রান্তিতে আলানপালান, জঙ্গল, মাঠ, পতিত জমি থেকে লতাপাতা শাকসবজি কুড়িয়ে খাবার বিধান। কোনো জাত বা প্রজাতির অভাব ঘটলে কৃষক নারী বুঝতে পারে কৃষিচর্চায় একটা দোষ ঘটেছে যার সংশোধন দরকার। চৈত্র সংক্রান্তি কৃষির ভুল সংশোধনের দিন।

আমাদের দেশের কৃষি নীতিতে পরিবর্তন হচ্ছে, আসছে প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি। তাহলে চৈত্র সংক্রান্তিতে কৃষক যখন তার আলানেপালানে মাঠেময়দানে কী আছে আর কী নাই তার হিসাব নিতে বেরোয় তখন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় খাদ্য উৎপাদন করার কথা বলে ক্ষতিকর প্রযুক্তি কীভাবে প্রকৃতি ধ্বংস করে। আমাদের খাদ্য ব্যবস্থার ওপর কীভাবে বড়ো ধরনের আঘাত হানা হয়।

আমাদের সংস্কৃতি ও উৎসবের তাৎপর্য তাহলে সংক্ষেপে কী?

প্রথমত গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য দিয়ে মানুষ যে জেনে বা না জেনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে নিত্য যুক্ত এই উপলব্ধি ও প্রজ্ঞা জারি রাখা। দ্বিতীয়ত, জীব হিসেবে প্রাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে নিজের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াকে প্রাণ ও প্রকৃতির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন চক্রের অন্তর্গত চালিকা শক্তি হিসেবে বিকশিত করা–যেন মানুষের বিকাশের সঙ্গে প্রাণ ও প্রকৃতির বিকাশ ঘটে, কিংবা প্রাণ ও প্রকৃতির বিকাশ যেন একইসঙ্গে প্রজাতি হিসেবে মানুষের বিকাশ হয়ে ওঠে। আমরা যেন প্রাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংসের কারণ না হই।

তৃতীয় তাৎপর্য পুঁজিতান্ত্রিক ও আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক। আমরা সমাজবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ও একাকী ব্যক্তি নই, আমরা সামাজিক। আমাদের সামষ্টিক সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তির বিকাশের জন্য উৎসব, সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্বকে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার বিপরীতে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে টিকে থাকার লড়াই হিসেবে বুঝতে হবে। সেভাবেই উৎসবকে সাজাতে হবে এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বিশ্বসভায় আমাদের ন্যায্য আসন আদায় করে নিতে হবে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান যেন আমাদের নতুনভাবে নিজেদের নিয়ে ভাবার এবং সামনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা হয়, সেটি কাম্য।

বাংলাদেশের পহেলা বৈশাখ

কুদরত-ই-হুদা

বাংলাদেশকে আলাদা করে চেনা যায় এমন সাংস্কৃতিক বিশেষত্বসম্পন্ন অনুষ্ঠানাদি এদেশে ঢের আছে। সেসবের মধ্যে পহেলা বৈশাখ নিঃসন্দেহে সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে। কারণ, অধিকাংশ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা কোটারি বাস্তবতা লক্ষ করা যায়। কোনোটি ধর্মের রঙে রঙিন, কোনোটি আঞ্চলিক সৌন্দর্যে মোড়ানো। আবার কোনো কোনোটি নির্দিষ্ট শ্রেণি-পেশা-নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব রুচি-পরিচয়ের সাথে গাঁথা। কিন্তু বাংলা সনের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখে বাংলাদেশের সকল মানুষের মন-ময়ূরা হাটে-মাঠে-বাটে-ঘাটে-দোকানে-পাটে সবখানে নিজের পেখম মেলে দেয়। এর ব্যাপ্তি রাজপ্রাসাদ থেকে কুঁড়েঘর পর্যন্ত বিস্তৃত।

পহেলা বৈশাখের কথা বললেই আমাদের মাথার মধ্যে কী কী ছবি ভাসে? গ্রামে গ্রামে পহেলা বৈশাখের সকাল থেকে নির্দিষ্ট স্থানে দূরদূরান্ত থেকে দোকানিরা বাহারি সব জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হয়। তাদের কি কেউ ডেকে আনে! না। তারা রাষ্ট্রের বা কোনো সর্দার-মাতবরের বা সংঘের আহ্বান ছাড়াই চলে আসে। যেখানে তারা আসে সেখানে বহুকাল ধরে মেলা হচ্ছে পহেলা বৈশাখে। তাই কারো ডাকের অপেক্ষা না করে শুধু দোকানি নয় চারদিক থেকে বানের স্রোতের মতো মানুষ আসে একদিনের উদ্‌যাপনে। বিনা ঘোষণায়, কারো মাতবরি-সরদারি ছাড়া উদ্‌যাপিত ও অনুষ্ঠিত হয় বলেই পহেলা বৈশাখ 'জাতীয়' ব্যাপার। যার জন্য ডাকতে হয় না, জাতি নিজে থেকেই শামিল হয়–তা-ই তো জাতীয়! পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অংশ।

ব্যাপ্তির বিচারে পহেলা বৈশাখ একটিমাত্র দিন। কিন্তু এর প্রতীক্ষা দীর্ঘদিনের। গ্রামের মানুষরা এই দিনের জন্য অপেক্ষা করে। শীতের শেষে প্রকৃতিতে গরমের একটু আভা পড়া মানেই পহেলা বৈশাখের দিকে ধাবিত হওয়া।

বাংলা বছরের প্রথম দিনটির কথা বললেই মাথার মধ্যে ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে হ্রেষাধ্বনি। চোখের সামনে যেন দেখতে পাই তেজি তেজি ঘোড়াগুলো দাপুটে খুর দিয়ে আঘাত করছে আস্তাবলের মাটিতে। খুরে তার দৌড়ের নেশা জেগেছে যেন। পিঠ পেতে রেখেছে কবে সেখানে লাফিয়ে উঠবে ছোকরা সওয়ার। পাঁচ-দশ-বিশটা ঘোড়ার সাথে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝখানের ছোট্ট রাস্তায় অমেয় ধুলো উড়িয়ে কবে বৈশাখী মেলায় ছুটবে এইসব ঘোড়া–ঘোড়দৌড় ছাড়া পহেলা বৈশাখের কথা ভাবতে পারে না জনপদের মানুষেরা।

শুধু কি ঘোড়দৌড়! পহেলা বৈশাখের মেলা মানে সারি সারি বিচিত্র সব মিষ্টির দোকান। বৈশাখী মেলার বেশ আগে থেকেই গুড়-চিনি-ময়দা-চুলা-আঁচা-লাকড়ি নিয়ে অস্থির সময় কাটে তার। সারা বছরের বেচাবিক্রির ঘাটতি পূরণ হবে ওইদিন। আর এই মেলায় ময়রা তো শুধু ময়রা না। যেন জাদুকর! কী অদ্ভুত দক্ষতায় সে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে জিলেপির আড়াই প্যাঁচ ঠিক ঠিক দিয়ে উঠতে পারে তা দেখার জন্যও লোকে ভিড় জমায়।

বিচিত্র বাঁশির শব্দে ঝালাপালা হয়ে ওঠা মানেই পহেলা বৈশাখের মেলা। তালপাতার বাঁশি থেকে শুরু করে মাটি দিয়ে বানানো চড়ুইপাখি বাঁশি, ময়নাপাখি বাঁশি, আড়বাঁশি, তরলা বাঁশের আরো নানা কিসিমের বাঁশি, হাওয়া বাঁশি, বেলুন বাঁশি–কী নেই!

বিচিত্র শব্দে নানা বাঁশি বাজছে, অফুরন্ত ধুলো উড়ছে। শিশু-কিশোরদের হাতে বিচিত্রবর্ণা বেলুন, চড়কের ঘুল্লি-চিৎকার, নাগরদোলায় চড়া মানুষের হল্লা ও ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ, গরিব মানুষদের একদিনের লোভাতুর জুয়াড়ি হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনি, চুড়ির ঝনৎকার ও কিন্নরকণ্ঠী নারীর পরিহাস-তরল কথার শব্দ, নকশাকাটা বিচিত্র হাঁড়ির ঠুনঠান আওয়াজ, সাজ-বাতাসা-কদমার সৌরভ, হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি, হুল্লোড়–সব মিলিয়ে পহেলা বৈশাখের মেলা এক জীবন্ত কার্নিভাল। প্রতিবার মুসলমান ঘরের মা-বাবা বলে দেবেন–বাচ্চারা মেলা থেকে যেন কোনো কিছুর মূর্তি কিনে না আনে। কারণ, তা 'হিন্দুর পরিচায়ক'; 'গুনাহগারির' ব্যাপার। কিন্তু প্রতিবারই বাড়িতে সেগুলো কিনে নিয়ে আসে বাড়ির ছেলেমেয়েরা। আনা উচিত হয়নি–একথা বলতে বলতে মা গুছিয়ে সেগুলো গুছিয়ে রাখেন পরম যত্নে। মাঝে মাঝে গ্রামীণ কুমোরের শিল্পগুণে মুগ্ধ হয়ে ওই পশুপাখি বা মনুষ্য-মূর্তির দিকে হয়তো দিকে তাকিয়ে থাকেন মা। পহেলা বৈশাখের মেলা বলতে তো এই-ই বুঝি। কারো আহ্বান-ঘোষণা ছাড়া ভেদচিহ্নহীন চৈতন্যে এক জায়গায় হওয়ার মতো সাংস্কৃতিক ঘটনা আমাদের জীবনে খুব কমই আছে।

বাংলা নববর্ষের দিনটি শুধু একটি দিন নয়। নয় শুধু একটি সাংস্কৃতিক উদ্‌যাপন। এর চরিত্রের মধ্যে বাংলার সমাজমানসের মধ্যেকার সামাজিক শক্তিকে আঁচ করতে পেরে ওঠার একটি ব্যাপার আছে বলে মনে করি। বাংলা নববর্ষের মধ্যে এক জায়গায় একত্র করার যে-শক্তি ও সক্ষমতা আছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীর যেকোনো জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী জাগরণের সময় এ ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য খুব কাজে লাগে। বাংলাদেশের ইতিহাসের ষাটের দশকেও কাজে লেগেছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে-বিকাশ ঘটেছিল তা ১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক স্বৈরশাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে কমবেশি বাধাগ্রস্ত হয়। মূলধারার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এই অবরুদ্ধতার কালে সংস্কৃতিচর্চা একটি বড়ো রাজনৈতিক ইভেন্টে পরিণত হয়। আবহমান কাল ধরে গ্রামবাংলায় বিচিত্র মেলা, হালখাতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নববর্ষ পালিত হলেও ৬০-এর দশকে এসে পূর্ব বাংলায় বিশেষত নাগরিক পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশ হিসেবে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হয়। ব্যাপকভাবে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় নববর্ষ পালনের প্রচলন হয় ১৯৬৪ সাল থেকে। গবেষকরা জানিয়েছেন, ১৯৬৪ সালের পটভূমিতে ১৯৬৬ সালে নববর্ষ নতুন 'উদ্দীপনা ও জঙ্গিপনা নিয়ে পালিত হয়'। এ সময় প্রকাশ্য জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রভাতফেরি। 'রাজপথে এতে ছাত্র-জনতার ঢল নামে' বলে অনেকে বলেছেন। কোনো কোনো ইতিহাস-গবেষক লিখেছেন, 'অভাবিত লোক-সমাবেশে ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টির কারণে সরকারও বিচলিত হয়ে ওঠে।' বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতির তরফ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার সংস্কৃতির জানান দিয়েছিল এই পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানাদি।

সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম ও প্রভূত আত্মত্যাগের সফল পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পহেলা বৈশাখের মতো একটি সাংস্কৃতিক বিষয়ের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ হয়নি। সংগত কারণেই অনেকে বলছেন, বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের যে সংস্কৃতি বিশেষত ঢাকায় গড়ে উঠেছিল তা এখন আর সবাইকে বা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে ধারণ করতে পারছে না। তারা বলছেন, এই উদ্‌যাপন যথেষ্ট ইনক্লুসিভ নয়। নতুন করে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের উদ্যোগ-আয়োজন এখন সময়ের দাবি। কথা হয়তো সত্য। কারণ, পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের সংস্কৃতি তো কেবল নির্দিষ্ট চৈতন্যের কিছু মানুষের না। এর উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানও নির্দিষ্টভাবেও করার বিষয় না। এটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। এটি সবার। সেই চরিত্রটি বজায় থাকা জরুরি–এই দাবি একেবারেই অমূলক নয়; বরং বাস্তবায়ন করাই উচিত।

পহেলা বৈশাখ পালনের এই ফ্যাঁকড়া বোধ করি শুধু ঢাকার মানুষের সাথে যুক্ত। এবং অবশ্যই ব্যাপারটি সাংস্কৃতিক রাজনীতির মামলা। কোটি কোটি সাধারণ মানুষের পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের সাথে সম্ভবত এর কোনো সম্পর্ক নেই। পহেলা বৈশাখ বাঙালি জনগোষ্ঠীর যাপন-সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে যুক্ত। এটি কোনো আলগা বিষয় নয়। এর মধ্যে কোনো কিছু যদি নতুন করে আসে তবে তা স্বাভাবিকভাবেই আসবে। কিছু বাদ গেলেও তা সাধারণ মানুষের যৌথ উপলব্ধির ভেতর দিয়ে সবার অলক্ষ্যেই বাদ যাবে। কারণ সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষ যা করে তাই। এটি অবশ্যই স্থিতিস্থাপক, জীবন্ত এবং পরিবর্তনশীল বিষয়।

বোশেখ

আল মাহমুদ

যে বাতাসে বুনোহাঁসের ঝাঁক ভেঙে যায়
জেটের পাখা দুমড়ে শেষে আছাড় মারে
নদীর পানি শূন্যে তুলে দেয় ছড়িয়ে
নুইয়ে দেয় টেলিগ্রাফের থামগুলোকে।

সেই পবনের কাছে আমার এই মিনতি
তিষ্ঠ হাওয়া, তিষ্ঠ মহাপ্রতাপশালী,
গরিব মাঝির পালের দড়ি ছিঁড়ে কী লাভ?
কী সুখ বলো গুঁড়িয়ে দিয়ে চাষির ভিটে?

বেগুন পাতার বাসা ছিঁড়ে টুনটুনিদের
উল্টে ফেলে দুঃখী মায়ের ভাতের হাঁড়ি
হে দেবতা, বলো তোমার কী আনন্দ,
কী মজা পাও বাবুই পাখির ঘর উড়িয়ে?

রামায়ণে পড়েছি যার কীর্তিগাথা
সেই মহাবীর হনুমানের পিতা তুমি?
কালিদাসের মেঘদূতে যার কথা আছে
তুমিই নাকি সেই দয়ালু মেঘের সাথী?

তবে এমন নিঠুর কেন হলে বাতাস
উড়িয়ে নিলে গরিব চাষির ঘরের খুঁটি
কিন্তু যারা লোক ঠকিয়ে প্রাসাদ গড়ে
তাদের কোনো ইট খসাতে পারলে নাতো।

হায়রে কত সুবিচারের গল্প শুনি,
তুমিই নাকি বাহন রাজা সোলেমানের
যার তলোয়ার অত্যাচারীর কাটতো মাথা
অহমিকার অট্টালিকা গুঁড়িয়ে দিতো।

কবিদের এক মহান রাজা রবীন্দ্রনাথ
তোমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন করজোড়ে
যা পুরানো শুষ্ক মরা, অদরকারি
কালবোশেখের একটি ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে।

ধ্বংস যদি করবে তবে, শোনো তুফান
ধ্বংস করো বিভেদকারী পরগাছাদের
পরের শ্রমে গড়েছে যারা মস্ত দালান
বাড়তি তাদের বাহাদুরি গুঁড়িয়ে ফেলো।

বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের

অনুষ্ঠান-তালিকা

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সরকার জাতীয়ভাবে বাংলা নববর্ষ এবং চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর নববর্ষ ১৪৩২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উৎসব আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বছর বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও রাখাইনসহ ২৭টি জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সর্বজনীন নববর্ষ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়েও এসব জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরে স্থানীয় উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। এবারের শোভাযাত্রায় গ্রামীণ কৃষির বিষয়টি একটি বড় থিম হিসেবে থাকবে।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে বিকাল ৩টা থেকে বৈশাখী ব্যান্ড শো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া বাংলাদেশের অন্যতম বন্ধুরাষ্ট্র চীনের সহযোগিতায় নববর্ষের দিন সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় একটি ড্রোন শো অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে ২০২৪-এর জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের বিষয়টি তুলে ধরা হবে। সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে 'সুরের ধারা' এবার বাংলা গানের বাইরেও ভিন্ন আয়োজন করবে। প্রতিবারের মতো রমনার বটমূলে 'ছায়ানট' বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করবে।

এ বছরই প্রথমবারের মতো জাতীয়ভাবে চৈত্র সংক্রান্তি উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে সরকার তিনটি পার্বত্য জেলায় এক দিনের সাধারণ ছুটি এবং দেশের অন্যত্র সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করেছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে আগামী ১৩ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকায় 'চৈত্র সংক্রান্তি কনসার্ট' আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ব্যান্ডসহ মাইলস্, ওয়ারপেজ, দলছুট, এভোয়েড রাফা, ভাইকিংস্ এবং স্টোন ফ্রি ব্যান্ড দল গান পরিবেশন করবে। এছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ১৩-১৪ই এপ্রিল ২০২৫ নবপ্রাণ আন্দোলন কর্তৃক আয়োজিত চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান 'বাংলার উৎসব ১৪৩২' অনুষ্ঠিত হবে। জেলা পর্যায়েও চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। বাঙালিসহ ২৮টি জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঐতিহ্যবাহী 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা' অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও ১২টি জেলায় চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখী সাধু মেলার আয়োজন করা হয়েছে। শ্রীমঙ্গলে উদ্‌যাপিত হচ্ছে ফাগুয়া উৎসব।

বাংলা একাডেমি পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে আয়োজন করেছে নববর্ষ বক্তৃতা। একাডেমি প্রাঙ্গণে বাংলা একাডেমি ও বিসিকের আয়োজনে ১-৭ই বৈশাখ ১৪৩২ অনুষ্ঠিত হবে বৈশাখী মেলা। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁওয়ে পহেলা বৈশাখ থেকে ১৫ই বৈশাখ ১৪৩২ পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে পহেলা বৈশাখের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ৩০টি জেলায় বৈশাখী লোকনাট্য উৎসব (প্রতিটি জেলায় ঐ জেলার পালাগান, কবিগান, পুথিপাঠ, জারিগান, পুতুলনাচ, লাঠিখেলা, ঢাকিনৃত্য এবং ঐতিহ্যবাহী লোকজ উপাখ্যান-সংবলিত লোকনাট্য উৎসব) ৩০শে চৈত্র থেকে ৬ই বৈশাখ ১৪৩২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ১২টি জেলায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অ্যাক্রোবেটিকস দলের মনোজ্ঞ বৈশাখী অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী ৩০শে চৈত্র থেকে ১৭ই বৈশাখ ১৪৩২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ১৭-১৯শে এপ্রিল কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত চৈত্র সংক্রান্তি/সাংগ্রাই বিজু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা কর্তৃক ১৩ই এপ্রিল ২০২৫ লোকজ সংস্কৃতি মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি কর্তৃক ৪-৭ই এপ্রিল ২০২৫ বৈসু, সাংগ্রাইং, বিজু, বিষু, বিহু, সাংলান ও বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উদ্‌যাপিত হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি কর্তৃক পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দে বৈশাখী শোভাযাত্রা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়াও ইতোমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ৩-৯ই এপ্রিল ২০২৫ বিজু, সাংগ্রাইং, বৈসুক, বিষু, বিহু মেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, নওগাঁ কর্তৃক ২৫ অথবা ২৬শে এপ্রিল বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে সারহুল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান কর্তৃক ১২, ১৩, ১৫, ১৭, ও ১৮ই এপ্রিল ২০২৫ সাংগ্রাই, বিজু ও বৈসু উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ১৪-১৮ই এপ্রিল ২০২৫ বিষু/চৈত্র সংক্রান্তি/পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলা, ঐতিহ্যবাহী নিকন খেলা ও স্বকীয় পোশাক প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।